Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শারিয়াহ উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশামনি

রোলঃ 227022281

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শারিয়াহ উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশামনি

রোলঃ 227022281

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুলারিজম নাকি শারিয়াহ উত্তম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আশামনি, আইডিঃ 227022281 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেকুলারিজম নাকি শারিয়াহ উত্তম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আশামনি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আশামনি

আইডিঃ 227022281

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা: 7

শারীয়াহর সংজ্ঞা: 12

সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ উত্তম: 15

উপসংহার: 30

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও বাদশা। যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়াময় এবং সকল কিছুর উপর শক্তিশালী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগূতকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।"[সূরা আল-বাকারাহ-২৫৬]

ধর্ম ও সেক্যুলারিজম একটা একটার বিরোধী ধারণা। অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী, ধর্মের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অতি প্রাকৃতিক শক্তির উপর শর্তহীন আস্থা ও বিশ্বাস। আল্লাহ বিরোধী সব ধরনের ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখান করে আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। অন্যদিকে সেক্যুলারিজমের অর্থ অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী, হচ্ছে শুধু বৈষয়িক বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে যা সম্পৃক্ত। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে- এটা ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন থাকবে। এর দ্বারা আরও বুঝায় যে, ইহা ধর্মীয় বিষয়সমূহের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক থাকবে ধর্ম থেকে। আর এটার মৌলিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, এটা হবে নন মনাস্টিক (Non Monastic) অর্থাৎ মসজিদ, মন্দির উপাসনালয়ের সাথে কোন ধরনের Relation থাকবে না।

আবার ইসলাম(اسلام) যা সালাম ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ শান্তি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা আকাংখাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দিয়ে শান্তি অর্জন করা।

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের **১৯** নং আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام. ُ

অর্থ: "আল্লাহর দৃষ্টিতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতির নাম। এটা সম্পূর্ণ জীবনাচরণের সমষ্টি মাত্র। এর দুটো দিক আছে। প্রথমত: আধ্যাত্মিক দ্বিতীয়ত: শারীরিক। আধ্যাত্মিক দিক ও শারীরিক দিক অর্থাৎ দুনিয়াবী দিকের সুন্দর ও অসাধারণ সমন্বয় হচ্ছে ইসলাম।

এ পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব ধর্মই হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বিশেষত ক্যাথলিক চার্চ সকলেই একথা বলে যে, তোমাকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট উৎসর্গ করতে হবে, পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে হবে, তোমাকে সন্ন্যাসীর মত কৌমার্য জীবন-যাপন করতে হবে।

একথার অর্থ হচ্ছে আপনার পিতামাতা দুনিয়া পরিত্যাগ করেননি বলেই আপনি পৃথিবীতে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ তারা ধার্মিক ছিলেন বলেই আপনি পৃথিবীতে বর্তমানে অস্তিত্ববান। যদি তারা ধার্মিক না হতেন তবে আপনাদের পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিলো অকল্পনীয়।

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা:

১. Encyclopedia Americana এর ২৪ নং Volume 8 সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:

Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.

সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।

Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.

সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

৩. English Secularism *বইয়ের প্রদত্ত সংজ্ঞা: Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, inadequate, unreliable or unbelievable.

সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবলমাত্র মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

8. Oxfor Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা: Secularism means the doctrine morality should be based solely on

১. Holyoake; English Secularism. A confession of Belief: (Chicago 1896)

regard to the wellbeing of mankind in the preser exclusion of all consideration drawn from belief or in future life.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

No-1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all from of religious faith.

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে যে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা মূল বইয়ের ২ নং Defination এর অনুবাদ।

Random House Dictionary of English Language (College Edition, New york-1968) গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

No-1. Not regarded as relgious & spiritually sacred.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No-2. Not partaining to or connected with any religion.

যা কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No-3. Not belonging to a religious order.

ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত ব্যবস্থা।

৭. The Advanced Learners' Dictionary of Current Engligh এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা:

-Worldly or material, not religious or spiritual.

ইহজাগতিক অথবা পার্থিব, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়।

The view that morality & education should not be based on Religion. সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে নৈতিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে হবে না।

৮. Oxford Advanced- Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা:
The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.

সমাজ সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এমন বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।
৯. Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

সেকুলারিজম জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

১০. Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা:
মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১১.মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে- Secularism তথা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'সমাজ ব্যবস্থা এমন নীতির উপর নির্ভর করিবে যাহাতে মানুষের নৈতিক আচরণ ও আচরণ-মান ইহকালীন ব্যাপার ও সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ও নির্ধারিত হয় এবং তজ্জন্য ধর্মের অনুশাসনের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নাই।'

১২.বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত English-Bengali Dictionary তে- Secular শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে- পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়জাগতিক,

লোকায়ত। আর Secularism সম্পর্কে বলা হয়েছে-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা, ইহবাদ।

১৩.A Short History of Secularism (Published in 2008 by I.B. Tauris & Co. Ltd, London) এর লেখক Graeme Smith সেকুলারিজমের ব্যাপারে লেখেন: The latin term from which the word 'Secular' is derived- 'Saeculum' means generation or age and came to mean that which belongs to this life, to the here and now in this world.It is used as a short hand for the ideology which shape contemporary society without reference to divine.

ল্যাটিন শব্দ- 'Saeculum' থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারেশন। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- যা ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসেবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহি) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

Graeme Smith আরো বলেন Secularism was born of

cristianity, daringly & originally. It is impossible to understand the idea of Secular without appreciationg that, at root, it is cristian.

এটা নির্ভয়ে বলা যায় যে, মূলত খ্রিস্টবাদ থেকে সেকুলারিজমের জন্ম।

এটা না বুঝার কোনো কারণ নেই যে, সেকুলার আইডিয়ার মূল জড় খ্রিস্টবাদের অভ্যন্তরে নিহিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর সারসংক্ষেপ:

Secular ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হলো- ইহজগৎ। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

সেকুলারিজম এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা মানবজাতির ইহজাগতিক কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠেছে। এর আওতাধীন বিষয়গুলো ইহজগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব। মানবরচিত এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে পরজগৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ মতবাদ 'ওহির' নাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে, ধর্মকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য মনে করে। এ মতাদর্শ মানুষের সামষ্টিক ব্যাপারও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি নয়। এ মতবাদ সৃষ্টিকর্তা ও পরকাল স্বীকার করে না- অন্যকথায় সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হলো- এমন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়।
সেকুলারিজমের উদ্ভব হয় খ্রিস্টীয় সমাজে রেনসাঁযুগে ইউরোপে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া (Reaction) হিসেবে সেকুলারিজমের জন্ম। সেকুলারিজমের জন্মের পশ্চাতে (Background) ধর্মযাজকদের কার্যকলাপ জড়িত। বলা হয় সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষ। সেক্যুলার রাষ্ট্র নাকি সবার জন্য এক নিরপেক্ষ স্থান তৈরি করে। এ দাবি ভুল। সেক্যুলারিজমের কোনো সংস্করণই নিরপেক্ষ না।

শারীয়াহর সংজ্ঞা:

শরিয়ত (شريعة) *শারি'আহ্* বা *শারি'আত্*, "কর্মপদ্ধতি") বা **ইসলামি আইন** বা **শরিয়ত আইন** হচ্ছে জীবনপদ্ধতি ও ধর্মীয় আইন যা ইসলামিক ঐতিহ্যের একটি অনুষঙ্গ। ইসলামি পরিভাষাকোষ অনুযায়ী, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং নবি হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) যেসব আদেশ-নিষেধ, নিয়ম-নীতি ও পথনির্দেশনা মুসলমানদের জন্য প্রদান করেছেন, তার সমষ্টিই হচ্ছে শরিয়ত। এটি ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন হতে উৎসরিত, প্রধানত কুরআন ও হাদিস হতে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে যথাক্রমে আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদে(সঃ) এর দিক নির্দেশনার উৎস। আরবিতে, স্রষ্টার অমোঘ স্বর্গীয় আইন বুঝাতে শরিয়ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

শরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অতঃপর আমি আপনাকে [মুহাম্মাদকে (সাঃ)] কর্মপদ্ধতির উপর (শরিয়তের উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তাই অনুসরণ করুন; আর আপনি মূর্খদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।' [সুরাতুল জাসিয়া:আয়াত-১৮]

আরবি ভাষায় শরীয়া বলতে পথ বোঝায়। আল্লাহকে খুশি করার লক্ষ্যে মানুষের জন্য অনুকরণীয় আচরণবিধি। শরীয়া বলবৎ হলে ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজের সকল ক্ষেত্র শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। শরীয়তের আওতায় ব্যবসায়-বাণিজ্য, পারিবারিক আইন, নৈতিকতা, অপরাধ ও শাস্তি, দান-খয়রাত সহ সবই রয়েছে। প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ আইনের চেয়ে এই ইসলামী শরীয়তের বিধানগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত।

শরিয়ার ভূমিকা বিশ্বজুড়ে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। উত্তর আমেরিকার কিছু বিচারব্যবস্থা শরিয়া ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা পাস করেছে, যা ধর্মীয় বা বিদেশী আইনের উপর বিধিনিষেধ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। শরিয়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, এলজিবিটি অধিকার এবং ব্যাংকিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিয়ে চলমান বিতর্ক রয়েছে। স্ট্রাসবার্গে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত (ECtHR) বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রায় দিয়েছে যে শরিয়াহ "গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির সাথে বেমানান"।

শরিয়ত হলো আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর দিকনির্দেশনার সমষ্টি। অতএব, শরিয়তের প্রধান বা মৌলিক উৎস দুইটি। যথা- আল্লাহর বাণী কুরআন ও

তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি (সুন্নাহ)। পরবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহর স্বীকৃতি ও নির্দেশনার ভিত্তিতে শরিয়তের আরো দুইটি বিষয় নির্ধারিত হয়। এগুলো হলো- ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং, শরিয়তের উৎস মোট চারটি।

- **কুরআন**
- **সুন্নাহ**
- **ইজমা**
- **কিয়াস**

ইসলামি কর্মপদ্ধতি বা শরিয়তের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সকল ধরনের ইসলামি আইন, আদেশ-উপদেশ, বিধিনিষেধ ও অনুশীলনের উৎস হলো শরিয়ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম (অর্থাৎ শরিয়তে আল্লাহ কর্তৃক সকল বিষয়বস্তু সংযোজন সম্পন্ন হলো), তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের [একমাত্র] ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। [সুরাতুল মায়িদা:৩]

যে শরিয়তের বিষয়বস্তুর পরিধি এতটা ব্যাপক, যে তা দীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণ হয়েছে (যেহেতু মুহাম্মাদ (সঃ) এর নবুয়ত দীর্ঘ ২৩ বছরে সম্পন্ন হয়েছে)। ইসলামি ধর্ম বিশারদগণ শরিয়তের বিষয়বস্তুকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন-

- আকিদা বা বিশ্বাসগত বিধিবিধান (আকাইদ)।
- নৈতিকতা ও চরিত্র সম্পর্কিত নিয়মনীতি (তাসাওউফ)।
- বাস্তব কাজকর্ম সংক্রান্ত নিয়মকানুন (ফিক্বাহ)।

ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামি আইনশাস্ত্রে চারটি উৎসকে শরিয়তের স্বীকৃত উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস ও ইজমা। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাযহাব হানাফি, মালিকী, শাফিঈ, হাম্বলী ইত্যাদি মতবাদে শাস্ত্রীয় উৎস সমূহ হতে শরিয়তের আইন নির্ণয়ের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, তা ইজতিহাদ নামে পরিচিত। নৈতিকতা ও চারিত্রিক নিয়মনীতি সংক্রান্ত বিধিবিধান দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা মুহলিকাত সমর্পিত নীতি ও মুনজিয়াত সমর্পিত নীতি। ব্যবহারশাস্ত্র বা ফিকহশাস্ত্রে শরিয়তের আইনসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকে। এ দুটি বিভাগ হচ্ছে ইবাদত সম্পর্কিত নীতি এবং মুয়ামালা সম্পর্কিত নীতি।

শরিয়ত-ভিত্তিক আইনে কোন কর্ম সংঘটনকে বিচারিক বিশ্লেষণ করতে আইনগত অবস্থার পাশাপাশি নৈতিক মানদন্ডেও বিবেচনা করা হয় এবং এ কারণে শরিয়তের সিদ্ধান্তসমূহ ফরজ (আবশ্যিক), ওয়াজিব (প্রণোদনামূলক), নফল (নিরপেক্ষ), হালাল (গ্রহণীয়), হারাম (নিষিদ্ধ), – এই পাঁচ শ্রেণির যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এ কারণে, শরিয়তের সিদ্ধান্তসমূহের কিছু কিছু ক্ষেত্র পাশ্চাত্যের আইনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ, বিশেষত প্রাত্যহিক জীবনাচার সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ইসলামি আদর্শ মোতাবেক, শরিয়ত হলো আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ ও বিধি- বিধান। সুতরাং শরিয়ত মেনে চললে আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) খুশি হন। অন্যদিকে, শরিয়ত অস্বীকার করা আল্লাহ ও তার রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর আদর্শ ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এমনকি শরিয়তের এক অংশ পালন করা আর অন্য অংশ অস্বীকার করা কুফর। কুরআনে আছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা গ্রন্থের (কুরআন) কিছু অংশ বিশ্বাস করো, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। আর মহাপ্রলয়ের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। [সুরাতুল বাকারা, আয়াত ৮৫]

সেক্যুলারিজম নাকি শারীয়াহ উত্তম:

সেক্যুলারিসম সব সময় মাধ্যমের কথা বলে, কিন্তু গন্তব্যের কথা বলে না। সেক্যুলারিসম মানুষকে গন্তব্যের কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, গন্তব্যের আলোচনা করতে হলে ধর্মকে লাগবে। সেক্যুলারিসম আপনাকে কোনো কাজের গুরুত্বের কথা বলবে, কিন্তু কাজের ফলাফলের ব্যাপারে বলবে না। অস্পষ্ট কিছু দাবি ছাড়া আর কিছু তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ফলাফলের আলোচনা করতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে। সেক্যুলারিসম আপনাকে ভোট দিতে বলবে। কিন্তু কোনো নৈতিকতা আর মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভোট দিতে হবে, সেটা বলবে না। কারণ, সেটা ধর্মের জায়গা। সেক্যুলারিসম বলবে সবাইকে সমানভাবে সম্মান করতে। কিন্তু সম্মানযোগ্য হবার অর্থ কী, সেটা বলবে না। কারণ, সম্মান ও মর্যাদার কেন্দ্রকে বুঝতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে। অনেকে ভাবতে পারেন এর অর্থ হলো মানুষ যত সেক্যুলার হবে তত নিরপেক্ষ হবে। এটা ভুল ধারণা। মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখনো খালি থাকে না। লিবারেল সেক্যুলারিসম যে শূন্যতা তৈরি করে কিছু না কিছু দিয়ে সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে আজ এই শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে বহুজাগতিক কর্পোরেশান আর অশ্লীলতা ও বিকৃতির প্রচারে সদাপ্রস্তুত মুনাফালোভী মিডিয়ার বানানো চটুল সাংস্কৃতিক আবর্জনা দিয়ে। একসময় এটাই হয়ে দাড়াচ্ছে জনগণের ধর্ম। মানুষের পরিচয় আর চরিত্রের কাঠামো। এটাই সেক্যুলারিসমের অবধারিত ফল এবং উদ্দেশ্য। এভাবে সেক্যুলারিসম মানুষকে পরিণত করে ক্ষমতার অনুগত গোলামে। এই বিষের প্রতিষেধক কী?

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিষেধক হলো প্রতিনিয়ত নিজের কাজগুলোকে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা। নিজের গন্তব্য এবং পরিণতির প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা। আর এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল তিনিই দিতে পারেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজের হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ভোগবাদী লিবারেল-সেক্যুলার সংস্কৃতির আবর্জনাগুলো দূর করুন। আর নিজেকে যুক্ত করুন চিরন্তন সত্য পথের সাথে। সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজম হলো রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র নিজে কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান মোতাবেক চলবে আর ব্যক্তি তার মতো করে ধর্ম পালন করবে। রাষ্ট্রের কাজে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। উল্লিখিত সংজ্ঞার বিচারে সেক্যুলারিজমের আবার দুটি দিক বেরিয়ে আসে।

১। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।

২। সব মতের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা।

এক. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থ হলো ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, বউ, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না; সমষ্টিগত জীবন (public life) হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটস-এর বিধান প্রয়োগ হওয়া শুরু করে। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়েও কোনো প্রকার হিউম্যানিজমবিরোধী হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। মোদ্দকথা, ব্যক্তিগত জীবন শুধুই 'আমি'র মাঝে সীমাবদ্ধ। 'আমি'-এর বাইরে গেলেই শুরু হয়ে যায় পাবলিক লাইফ। বুঝতেই পারছেন ধর্মকে এরা কোথায় নিক্ষেপ করতে চায়। বাস্তবতা হলো, সেক্যুলারিজম ব্যক্তি- জীবনকেও প্রভাবিত করে। কারণ, সেক্যুলারিজমের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এটা গৌণ বিষয়। সেক্যুলারিজমের মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফকে দীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোনো কাজকে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে।এটা মুসলিম জীবনে সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটারসহ অনেক হারাম ক্যারিয়ারিস্ট মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে নামাজ- রোজা পালন করছে; কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বৈধ মনে করছে। এমন আচরণ সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। আবার এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তি-জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা সেক্যুলারিজমেরই অংশ। ধর্মীয় বিধানাবলিকে নিছক ওহির টেক্সট থেকে গ্রহণ না করে নিজস্ব আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তিগত প্রবণতা ধর্মীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করারই ভিন্ন চিত্র। এজন্য কেউ নিয়মিত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেও ধর্মীয় কর্তৃত্বের জায়গায় অস্বীকারকারী হতে পারে। মুসলিম সমাজে এমন লোকের অভাব নেই বর্তমানে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কেবল রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সমাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি-জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেউ সেগুলোর অনুসরণ করতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানরা কার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ সর্বত্র কার বিধান চলবে?এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ফলে ইসলাম তার অনুসারীদের সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো ক্ষেত্রে এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে ইসলাম তাকে নিজ অনুসারীদের কাতারে জায়গা দেয় না। নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল উলুহিয়্যাত, উবুদিয়্যাত।' কারণ কাফেররা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বিশ্বপরিচালনাকারী সত্তা হিসেবে স্বীকার করত; কিন্তু তাকে একমাত্র মাবুদ ও হাকিম হিসেবে মানত না। আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত অস্বীকার করত। আর সেক্যুলারিজমের মূল কাঠামোই 'আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করা', যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাত বলেছেন।" আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে বাদ দিয়ে জাহিলিয়্যাত গ্রহণ করাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুফর এবং শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

হেদায়েত ও শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট গ্রহণকারী উম্মাহর মহান সালাফ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং বর্তমান আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'ফাসলুদ দীন আনিদ দাওলাহ আও আনিস সিয়াসাহ' তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা সুস্পষ্ট কুফুর। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসনব্যবস্থা কামনা করে! বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে আছে?(সূরা মায়িদা:আয়াত-৫০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে আল্লাহর অকাট্য বিধান ছেড়ে দেয়; অথচ তা সকল কল্যাণ সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু নিষিদ্ধ করে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষ, আল্লাহর শরিয়তের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যেমনটা করত জাহেলি যুগের

মানুষেরা। তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত মত থেকে প্রণীত জাহেলি ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করত। যেমন, তাতাররা তাদের সেসব রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করেছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। চেঙ্গিস খান তাদের জন্য 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামি, নাসরানি, ইহুদিসহ বিভিন্ন শরিয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যা সে শুধু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। তারপর তা তার অনুসারীদের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় সংবিধানরূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং কমবেশি যাই হোক, যেকোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুকে ফয়সালাকারী হিসাবে গ্রহণ না করে।

আল্লামা মুসতফা সাবারি" রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা আর দীনে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই দুই বিশ্বাস কখনো এক হতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি তার সাধারণ সামাজিক জীবনে দীনের এই কর্তৃত্ব মেনে না নেয় যে, দীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলির মধ্যে দখল দেবে, তা হলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কীভাবে খারিজ হবে না, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কর্তৃত্ব এবং এই দখলদারত্ব মেনে না নেবে!'"""

আল্লামা জাহেদ কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফুর। শাইখ সালেহ আল ফাওজান রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার মতাদর্শ গ্রহণ করবে সে কাফের। বাংলাদেশের উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা'র মুদির মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ তার এক বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের ভিত্তি হলো আল্লাহর কালাম কুরআন মজিদ।

তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যা স্পষ্টতই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি। সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় দিক

হলো সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যেই মাপকাঠি গ্রহণ করবে, তা মেনে নেওয়া। অন্যভাবে বললে, টলারেন্স-এর উদ্দেশ্য হলো, ভিন্নমতকে শুধু মেনে নেওয়াই নয়; বরং ভালো-মন্দের ধারণাগুলোর ভিন্নতাকে গুরুত্বহীন এবং অনর্থক মনে করা। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার দাবি হলো, কেউ নিজের কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে অন্যকারো সমালোচনা করার কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি একজন পিতা তার সন্তানকেও নামাজ পড়ার জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। জীবনপরিচালনার প্রতিটি পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমানভাবে মেনে নেওয়ার নাম টলারেন্স। যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ এবং জীবনপরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি ও ধারণা সমান মর্যাদার, তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো অন্যের খায়েশ ও প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া এবং তাকে সম্মান করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করার অর্থ হলো- ইসলাম ঘোষিত 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' প্রত্যাখ্যান করা। কারণ যখন ভালো-মন্দ নির্ধারণ করাকে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা হিসেবে মেনে নেওয়া হবে এবং কল্যাণের সমস্ত ধারণা সমান চোখে দেখা হবে, তখন মন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। যে যার মতো করে ভালো-মন্দের সংজ্ঞা বানিয়ে নেবে আর সবাইকে অপরের এই ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এই অবস্থাতে পৃথিবীতে মন্দ বলে কিছু থাকছে না। ফলে নাহি আনিল মুনকারের প্রশ্নই আসছে না। এই অবস্থাতে যদি ইসলামের নির্দিষ্ট কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে আমাদের কাছে কোনো মন্দাচার ধরা পড়ে, তা হলে তা মেনে নিতে হবে। তাকে প্রতিহত করার কোনো চিন্তাভাবনা এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালানো যাবে না। পশ্চিমা আকিদার দাবি হলো, অন্যের প্রতিটি কাজ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মোটকথা, টলারেন্সের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত 'নাহি আনিল মুনকার' সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে পৃথক মূলনীতি হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো, ইসলামও কল্যাণের সমস্ত ধারণা এবং মাপকাঠিকে সমান মনে করে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ কোনো জীবনব্যবস্থা নয় এবং ইসলাম একমাত্র কল্যাণ নয়; বরং ইসলাম একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থার অংশমাত্র, যেখানে কল্যাণের সমস্ত ধারণা ও মাপকাঠি সমান আর সেই ব্যবস্থার নাম হলো লিবারেলিজম। এমন দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। কারণ, দুনিয়ার সকল মত ও পথের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ স্বাধীন পরিবেশ নিশ্চিত করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়

(সেক্যুলারিজমেরও না)। ইসলাম শুধু কিছু বিশ্বাস এবং নৈতিকতার নাম নয় যে প্রতিটি জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামকে মেলানো যাবে; বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার মাঝে আকিদা ও নৈতিকতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অবস্থা বা কাজের বিধান রয়েছে। ইসলাম কখনোই অনেকগুলো কল্যাণের ধারণার মধ্য থেকে একটির দাবি করে না। বরং ইসলাম নিজেকে একমাত্র সত্য ও কল্যাণ হিসেবে ঘোষণা করে। সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে টলারেন্স এবং plurality (বহুত্ববাদ) এর কথা বলাই একটি অনর্থক বিষয়। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তি হক ও বাতিল চিহ্নিত হওয়ার পর এই দুটো বিষয়কে সমমর্যাদা ও অধিকার দিতে পারে না। উভয়টির জন্য সমান পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। এটা মারাত্মক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। ইসলাম tolerance এবং plurality of goods এর নীতিকে ধারণ করে- এমন দাবি হাস্যকর। যখন ইসলাম দাবি করছে ইসলামই একমাত্র হক এবং মুক্তি ও সফলতার অদ্বিতীয় পথ; অন্যান্য সব জাহান্নাম ও ধ্বংসের রাস্তা তখন ইসলাম ছাড়া সব বাতিল শক্তি প্রতিপালন করা এবং লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে তাদের উন্নতির সর্বপ্রকার সহজ ব্যবস্থা করে দেওয়া মূলত ইসলামের উক্ত দাবির বিরোধিতা করা। যদি কেউ বাস্তবেই ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তা হলে তাকে এটাও মানতে হবে যে, ইসলাম পৃথিবীতে নিজস্ব জীবনব্যবস্থার বাইরে অন্যান্য জীবনব্যবস্থাকে পরাজিত করবে। একটি জীবনব্যবস্থাকে বাতিল মানা হবে আবার তার বিজয়কে বরদাশত করা হবে- এটা হাস্যকর ব্যাপার। একজন নির্বোধ মানুষই এমনটা মনে করতে পারে। কোনো জিনিসকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করার পর পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তাকে বিস্তার করার অধিকার দেওয়া আত্মঘাতী ও বোকামি সিদ্ধান্ত ছাড়া কী হতে পারে? ইসলামের নিজেকে একমাত্র সত্য হিসেবে ঘোষণা করা এবং সর্বশক্তি- যোগে এর প্রতি আহ্বান করার আবশ্যকতা হলো, ইসলাম অন্য সব ব্যবস্থাকে মিটিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানাবে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার অনুসারীদের জানমাল উৎসর্গ করার নির্দেশ দেবে। কাফেররা আমাদের এই প্রচেষ্টা সহ্য করবে কি না এবং অমুসলিমদের সাহায্য আমরা পাব কি না- এখানে এসব প্রশ্নের কোনো তাৎপর্য নেই। ইসলামের এমন মৌলিক অবস্থার স্বাভাবিক ফল হলো, প্রকৃত মুসলিমের অস্তিত্বই কুফুরি রাজত্বের জন্য হুমকি হয়ে থাকবে। কারণ, কেউ মেনে নিক বা না নিক, সর্বাবস্থায় নিজের অনুসারীদের প্রতি ইসলামের দাবি হলো, যেখানে আল্লাহর রাজত্ব

প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে সে তার হাকিমিয়্যাত প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করবে। নিঃসন্দেহে ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা তা-ই, যা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মূলত শান্তি ও নিরাপত্তার ইউনিভার্সাল কোনো কনসেপশন নেই। প্রতিটি জীবনব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট কনসেপ্টের শান্তি ও নিরাপত্তার দাবি করে। এর কারণ হলো অধিকারের ব্যাখ্যার ভিন্নতা। শান্তি কিংবা নিরাপত্তার মানে হলো, কোনো জীবনব্যবস্থা ব্যক্তির জন্য যেসব অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তা সংরক্ষণ করা। যেমন, ইসলাম সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে না, তাই ব্যক্তিকে এই কর্মের অনুমোদনও দেয় না। এই কাজে তার জন্য ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দাবি করে এই সভ্যতা। পাশ্চাত্যের শান্তির কনসেপ্ট বুঝার জন্য নোবেল পুরস্কার আমাদের সামনে এক স্পষ্ট উদাহরণ। এই পর্যন্ত তাদেরকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যারা কোনো না কোনোভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করেছে কিংবা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও দর্শনের উপকার করেছে। এজন্য কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়, সে কাফেরদের এই পুরস্কার নিয়ে গর্ব করবে, ফ্যান্টাসিতে ভুগবে এবং একে ভালো চোখে দেখবে। এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝার কারণে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ শান্তি ও নিরাপত্তাকে ইউনিভার্সাল মনে করে। এর সবচেয়ে বাজে দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মাকাসিদে শরিয়াহর অধ্যায়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তির উদ্দেশ্য কেবল জান-মালের নিরাপত্তা নয়। একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে জিনা থেকে, পাপাচার থেকে, সমাজে প্রচলিত নানা অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারছে কি না ইসলামে এটাও নিরাপত্তার অংশ। ইসলামি শরিয়ত ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি ধর্তব্য নয়। কারণ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রকৃত অর্থ হলো, শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ করা। শরিয়তের বাইরে অধিকারের অন্য কোনো ব্যাখ্যার সংরক্ষণ করা মানে জমিনে ফ্যাসাদ ও জুলুম প্রতিষ্ঠা করা। শরয়ি অধিকারসমূহের সংরক্ষণ একমাত্র ইসলামি ইমারাহ-ই করতে পারে। এজন্য শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন কুফুরি (তাগুতি) ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে ইসলামি শাসন চালু হবে। এ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেউ যদি ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তার এই অর্থ বোঝে যে তাগুতি এবং শয়তানি শাসন-ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করবে এবং মুসলমানদের উপর কোনো আঘাত আসবে না তা হলে সে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই

বুঝতে পারেনি। কুফর ও তাগুতের প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা আদতে কোনো নিরাপত্তাই নয়; নিছক ধোঁকা। কুরআন বলছে,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرٰى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। (সুরা বাকারা- আয়াত ১২০)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি সম্ভব হয়। (সুরা বাকারা-আয়াত ২১৭)

সুতরাং ইসলামকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তাই ইসলাম কামনা করে। এর মাঝেই ইসলাম মানুষের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা দেখে। কুফুরি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হলো, পুরো মানবজাতি স্বস্তির সাথে জাহান্নামের পথে চলার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার এমন ধারণা মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সাথেই সাংঘর্ষিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

বিশ্ব সমাজে তোমরা মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছ। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অসৎকাজে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর ঈমান আন। (সুরা আলে ইমরান-আয়াত ১১০)

হাদিস শরিফে আছে, 'তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পেলে তা যেন হাত দিয়ে দমন করে, হাতে না পারলে মুখে দমনের কথা বলবে। এটাও না পারলে অন্তর দিয়ে দমন করার প্লান-প্রোগ্রাম সাজাবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমার পূর্বে যত নবী প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সকলেরই এমন কিছু সাথি-সহযোগী ছিল, যারা নবীদের সুন্নত আঁকড়ে ধরত এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলত। অতঃপর এমন অযোগ্য উত্তরসূরি আসত, তারা যা বলত নিজেরা তা করত না এবং সেই কাজই করত, যা তাদের করতে বলা হয়নি। এমন লোকেদের সাথে যে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে জবানের সাহায্যে জিহাদ করবে সেও মুমিন, যে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। কিন্তু এর পরবর্তী স্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।

উল্লিখিত হাদিসগুলোতে সুস্পষ্টভাবেই সেসব লোকের ঈমান নাকচ করা হয়েছে, যারা অন্তর দ্বারা মন্দকে মন্দ মনে করে না। মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখে ব্যথিত হয় না এবং তাকে নিঃশেষ করার জন্য কোনো সংকল্পও করে না। ভালো কাজে প্রশান্তি লাভ এবং মন্দ কাজে ব্যথিত হওয়াকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের আলামত বলেছেন। টলারেন্সের দর্শন মূলত ঈমানের সাথেই সাংঘর্ষিক। কারণ এর সোজা কথা হলো মন্দ বলতে কিছু নেই।কুরআনুল কারিমের বহুল ব্যবহৃত একটি আয়াত-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।(সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৬)

কুরআনের এই আয়াত ব্যবহার করে অনেকে টলারেন্সের দর্শনকে ইসলামি দর্শন প্রমাণ করতে চায়। ব্যাপক অর্থে তারা বুঝাতে চায় যে দীনের যেকোনো ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করা নিষেধ। এটা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। কারণ এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের সকল বিধান অনর্থক হয়ে পড়ে। এখন যদি দুজন নারী পুরুষ মিলেমিশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তা হলে ইসলাম তাদের উপর হদ প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবে সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে; যদি আয়াতের এমন ব্যাপক অর্থ নেওয়া হয়। তা ছাড়া কোনো মুফাসসির আয়াতটির এমন

তাফসির করেননি। আয়াতের অর্থ হলো, কোনো মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। এই ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি অর্থহীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের উপর ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। বরং যার জন্য যেই বিধান ও বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য, তা তার উপর যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে। মূলত ইসলামে সব ধরনের জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয়। বরং যেই জবরদস্তি শরিয়তে নেই, তাকেই কেবল ইসলাম নাকচ করে। আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতটি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য, যে শরিয়তবহির্ভূত পন্থায় জবরদস্তি করে। যেমন, কেউ কোনো পুরুষকে চাপ দিল তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে (এটা নিষিদ্ধ)। তবে যখন শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় জবরদস্তি করা হবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য হবে। যেমন, কোনো কাফের তরবারির ছায়ায় ইসলাম কবুল করল।

সুতরাং ইসলামে নিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার বলতে কিছু নেই। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে। শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার বাস্তবায়িত করে। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। এটাই ইসলামের পরিশান্তি, নিরাপত্তা, সমতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে ইসলামকে জাস্টিফাই করার অধিকার কারো নেই। কারণ ইসলাম এগুলোর দাবি করে না। ইসলামে নিরপেক্ষতা কিংবা সমতা থাকলে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি কুফর প্রচারেরও অনুমোদন থাকত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র কখনোই কুফর প্রচারের অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণরূপে কুফরের প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করে। জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে আহলে কুফুর কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ পালন করতে পারে। তবে তাও মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে এবং অত্যন্ত গোপনে।

ইসলামে নিরপেক্ষতা থাকলে একজন অমুসলিমও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করত। কিন্তু ইসলাম কোনো অমুসলিমকে সেই অধিকার দেয়নি। এটাই ন্যায্য বিধান। ইসলামি রাষ্ট্রে চুক্তি ও জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যারা জিম্মি হবে, তাদেরকে ইসলাম নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা এতো ব্যাপক না এবং ইসলামের মতো সমান অধিকারও না সেটা। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও সীমাবদ্ধতা জারি করার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় সুবিধা পাবে। এখনকার মতো অলিগলিতে শিরক ও কুফুরের জৌলুস, পরিবেশ ভারি-করা আয়োজন, নির্লজ্জ ও অশ্লীল মহড়া এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের অনুমোদন তারা পাবে না। এগুলো ইসলামসমর্থিত অধিকার নয়। জিম্মিদের বিধান নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার

সুযোগ নেই। ফিকহের প্রতিটি গ্রন্থে উম্মতের ফকিহগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মোটাদাগে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো,

১। জিজিয়া প্রদান ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার পাবে না।

২। নতুন কোনো উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না (যদি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি থাকে তবে ভিন্ন কথা)।

৩। নিজেদের ধর্মের প্রচার চালাতে পারবে না মুসলিমদের মাঝে।

৪। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে তারা নিয়োগ পাবে না।

এই ধরনের কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে, যেগুলো সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বর্তমান সেক্যুলার অধিকার ইসলাম দেয় না। ইসলাম তাদের যতটুকু অধিকার দেয়, তাই ন্যায্য। আমরা মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আজকাল এসব বিষয় কাটছাঁট করে থাকি। এই ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করা বড় ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায়; অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য কাটছাঁট না করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরাই অধিক ফলপ্রসূ। মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানো আমাদের দায়িত্ব না। আল্লাহ এই ক্ষমতা কোনো মানুষকেই দেননি। ফলে এমন কাটছাঁটের বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে- আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ফেলছি। আমরা ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করলে আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান তার কাছে এটাই সত্য ও ইনসাফ মনে হবে। আর যাকে চান না তার কাছে গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি মনে হতে পারে। কিন্তু তার এই ধারণা দূর করার জন্য কাটছাঁটের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপসহীনভাবে ইসলাম যা বলেছে, তা পালন করে যাওয়া। আমরা নিজেদের শরিয়ত নিয়ে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগি। আমরাই নিজেদের শরিয়তকে একরকম উগ্রতা, গোঁড়ামি ও বেইনসাফি মনে করি। তা না হলে তো এসব বিধানের ব্যাপারে

পাশ্চাত্যের সাথে আপসের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ত না। আল্লাহ যে অধিকার অবস্থাভেদে মানুষকে দিয়েছেন, তা আসলেই ন্যায্য কি না- এ ব্যাপারে আমরা দ্বিধা-সংশয়ে ভুগি। আমরা কোনোপ্রকার তোষামোদি ছাড়া বলতে পারি না এটাই ন্যায় ও সত্য। এর একমাত্র কারণ আমরা পাশ্চাত্যের মানদণ্ড মেনে নিয়েছি। অথচ একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রে কোনো অ-সেক্যুলার বেঁচে থাকার অধিকার পায় না। যেখানে সেক্যুলারিজম অ-সেক্যুলার নাগরিকদের উপর হত্যা কিংবা বন্দির বিধান প্রয়োগ করতে কোনো কপটতার আশ্রয় নেয় না, সেখানে কীভাবে আমরা নিজেদের শরিয়তের ব্যাপারে এমন কপটতার আশ্রয় নিতে পারি; অথচ আমাদের শরিয়ত এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সবকিছুর মালিক, সেক্যুলাররাও যার সৃষ্টি? স্রষ্টার সাথে বিদ্রোহ করার ব্যাপারে তারা এতটা আপসহীন হতে পারে আর আমরা রবের দাসত্বে আপসহীন হতে পারছি না! ইতোপূর্বে সেক্যুলারিজমের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, পরিণামের দিক থেকে সংজ্ঞাটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানি ধর্মকে পৃথক করে তবে ব্যক্তিগত বিষয় বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপূজারি আরেকটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের শরিয়ত কিংবা সাংবিধানিক মাপকাঠি হলো হিউম্যানিজম। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেক্যুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল গ্রহণ করতে এবং হারাম বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা রয়েছে। সেই ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা, একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেক্যুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেক্যুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং সে নিজেই একটি ধর্ম।

তবে চিন্তার বিষয় হলো, সেক্যুলারিজম সকল ধর্ম সরিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও কেবল ইসলামের সাথেই কেন সূচনালগ্ন থেকে এর সামগ্রিক সংঘর্ষ চলে

আসছে এবং ইসলামের উপরই কেন তার আঘাতটা বেশি পড়ছে? এর প্রধান কারণ তো তা-ই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ১৪শ বছর আগে। ُوَالْكُفْرُ مِلَّهُ وَاحِدَة

অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফরিশক্তি একজোট।" তবে এর অন্তর্নিহিত কারণটা দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এবং আদর্শিক। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম মূলত কিছু বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের নাম। জীবনের সামগ্রিক নির্দেশনা সেসব ধর্মে নেই। ব্যক্তিগত কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মাঝেই সেই ধর্মগুলো সীমাবদ্ধ। ব্যাপকভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিধানশূন্য। ফলে সেই শূন্যস্থান কোনোপ্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই পাশ্চাত্য সভ্যতা পূরণ করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে শূন্যস্থান বলতে কিছু নেই। যার দরুন পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কিছু এখানে অনুপ্রবেশ করতে হলে শূন্যস্থান তৈরি করে নিতে হবে। আর কোনো ভরাট জায়গায় শূন্যস্থান তৈরি করতে গেলেই সংঘর্ষ, মারামারি ও কাটাকাটির ব্যাপার চলে আসে। কোপটা তাই ইসলামের উপরই বেশি পড়ে। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির সাথেই ইসলামের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের আলোচনায় বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেক্যুলারিজম যেমন ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে না, তেমনিভাবে সব ধর্ম ও মতবাদের প্রতি সে নিরপেক্ষও থাকে না। কারণ সেক্যুলারিজমের নিজস্ব আইনি কিংবা সাংবিধানিক কাঠামো আছে। আছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে আলাদা ধারণা। সেক্যুলারিজম তার নিজস্ব মাপকাঠি অনুযায়ী বিচার করে দেখবে কোন বিষয়টা তার সাথে সাংঘর্ষিক কিংবা তার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এমন যেকোনো বিষয় সে দমন করবে এবং নিষিদ্ধ করবে। এই অর্থে সে কখনোই নিরপেক্ষ কিংবা টলারেন্ট হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে তো নয়ই, ব্যক্তিগত "র্যায়েও সেক্যুলারিজম অনেক সময় নিরপেক্ষ নয়। এজন্য দেখা যায় 'হজাব, ।বয়ে, দাড়ির মতো ব্যক্তিগত ইসলামি বিধানগুলোও সেক্যুলার রাষ্ট্রে নানাভাবে আইনি জটিলতার শিকার হচ্ছে। এসব ঘটনা অহরহ ঘটছে। বিষয়টি এখন সবার কাছেই স্পষ্ট। কারণ, এগুলো তাদের ব্যক্তি- স্বাধীনতায় খারাপ প্রভাব ফেলে। এখানে এসে জেনারেল উইল এবং উইল অফ অলের পার্থক্য বুঝার গুরুত্ব ধরা পড়ে। মূলত পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা (no

position) বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। এই অর্থে যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে, তারা যেন সমস্ত উসুল থেকে বেরিয়ে শূন্যে অবস্থান করছে। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না। দুনিয়ায় এমন কোনো অবস্থান নেই, যা নিরপেক্ষ হতে পারে। উদাহরণত কেউ বলল, 'আমি অমুক বিষয়ে মুসলিম না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করব।' এমন মন্তব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা। ইসলামের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সে তো কুফুরি অবস্থান গ্রহণ করছে। সেটা আবার নিরপেক্ষ হয় কীভাবে! ইসলামের বাইরে যাওয়ার অর্থই হলো কুফুরি গ্রহণ করা। আর কুফর স্বয়ং একপাক্ষিক অবস্থান। ঈমান ও কুফুরের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। ইমামগণ বহু আগেই এই অবস্থান নাকচ করে গেছেন। 'আবদিয়্যাত' থেকে বেরিয়ে মানুষ কখনো নিরপেক্ষ হয় না। বরং সে খায়েশ এবং শয়তানের গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْنَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।(সুরা কাসাস, আয়াত ৫০)

সুতরাং ইসলামে যেমন কোনো নিরপেক্ষতা নেই তেমন সেক্যুলারিজমেও কোনো নিরপেক্ষতা নেই। হয়তো ইসলাম নয়তো কুফর। কোনো মুসলমান সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করতে পারে না। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে সব মতের লোক সমান অধিকার পায় না, কোনো কাফের মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো পদ লাভ করতে পারে না। সেক্যুলারিজমও এর ব্যতিক্রম নয়। কার্যত কোনো মুসলিম সেক্যুলার রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করতে পারে না। এর জন্য তাকে সেক্যুলার হতে হয়। কুরআন-সুন্নাহর উপর সেক্যুলার সংবিধানকে প্রাধান্য দিতে হয় তাকে। এই শপথ না করে সে কোনো পদ লাভ করতে পারবে না। সেক্যুলার শাসন-ব্যবস্থা তার সেক্যুলারিজম নামক ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের বাইরে অন্য নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, তার বসবাসের অধিকারই মেনে নেয় না। হয়তো তাকে হত্যা করে কিংবা বন্দি করে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কখনোই নিরপেক্ষ

হতে পারে না। তা কখনো সব মত ও পন্থাকে সম-অধিকারও প্রদান করে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য সেক্যুলারিজম কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না; যেহেতু এটা প্রথমেই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে।

আমাদের উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিক হোক কিংবা ফলগত, কোনো দিকই ইসলামসম্মত নয়। শরিয়ত উভয় দিকই প্রত্যাখ্যান করে।

উপসংহার:

সেক্যুলারিজমকে যারা ধর্মীয় পোশাক পরাতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে মদিনা সনদকে। 'মদিনা সনদ'কে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা করে ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যে রাসুলকে প্রেরণই করা হয়েছে ইসলামকে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে সকল বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, তার ব্যাপারে এমন দাবি করা যে জঘন্য অপবাদ-তা একজন চিন্তাশীল সাধারণ মুসলিমেরও বুঝে আসার কথা। উপর্যুক্ত দাবি এতটাই অনর্থক যে, এটাকে খণ্ডন করা কেবল সময় নষ্ট করা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলমানরা উপর্যুক্ত দাবিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাই কালের বিবর্তনে সেই সময় নষ্ট-করা কাজটিই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে একেবারে সংক্ষেপে মদিনা সনদের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব।

এক. ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সালাফদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মদিনা সনদের টার্ম ব্যবহার করেননি এবং কেউই মদিনা সনদকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবিদের যুগ পেরিয়ে ইমাম-সালাফদের কারো কাছ থেকেই এটা প্রমাণিত নয়।

দুই. মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক অবস্থায় শত্রু না বাড়িয়ে বরং এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুকে ব্যবহার করা। আর কোনো অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা অস্তিত্বে আসেই একটা সাময়িক এবং আপাত-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, যা চূড়ান্ত কিছু হয় না। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তির কথাই ধরা যাক। সেখানে চুক্তির একটি বিষয় ছিল কোনো কাফের মুসলমান হয়ে রাসুলের কাছে চলে এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এটা ছিল সাময়িক সিদ্ধান্ত। মৌলিকভাবে ইসলাম কখনোই এটা সমর্থন করে না।

তিন. মদিনা সনদ কেন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এর সবচেয়ে বড় সত্য উত্তর হলো, ইসলামি শরিয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অনেক বিধান এসেছে, যা মদিনা সনদে ছিল না। এমনকি তখন জিজিয়ার বিধানও ছিল না। ফলে মদিনা সনদ চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো বিষয়ের মধ্যে পড়ে না যে, কেবল এর ভিত্তিতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

চার. সর্বশেষ বিষয় হলো, কেউ যদি মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করে তবে সেখানে সে কোনোভাবেই সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না। কারণ মদিনা সনদের অন্যতম প্রধান ধারাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। এই ধারাটি এতটাই সামগ্রিক যে মদিনা সনদের পরে আসা শরিয়তের সমস্ত বিধান শামিল করে নেয় এবং এই ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি; মদিনা সনদ নয়। এ ছাড়াও কেউ কেউ সেক্যুলারিজমকে তার পারিভাষিক রূপ থেকে বের করে এর ইসলামি সংজ্ঞা দাঁড় করাতে চায়। এখানে কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত বিজাতীয় যেকোনো পরিভাষাকে ইসলামিকরণ করা শরিয়ত- সমর্থিত নয়। পরিভাষা অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধরুন আমরা সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমরাও সেক্যুলারিজমকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাস করি। এখানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো, আমরা আদর্শিকভাবে সেক্যুলারিজমকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিচ্ছি। এখানে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সেক্যুলারিজম ফোকাসিং হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামই যে একমাত্র মানদণ্ড, কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা, শরিয়তই একমাত্র নৈতিকতা এবং আদল- নিজেদের এই মানদণ্ড এবং দাবির জায়গায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা প্রথম সমস্যা যে আমরা মানদণ্ডের জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি। আর বিশ্বব্যাপী তাদের মানদণ্ডই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে নানান ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নানা ব্যাখ্যা আওড়িয়ে বলেননি যে ইসলামেও কুফর আছে। কুফর কুফরই, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এর আরেক সমস্যা হলো, মানুষকে আমরা লুকোচুরির মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি যে, আমরাও সেক্যুলারিজমের চর্চাকারী। এটা কখনো মানুষকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক কিংবা আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করবে না। দিনে দিনে তাদের মনে সেক্যুলারিজম নামক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বলয় দিন দিন মূলধারার সেক্যুলারিজমেই ফিরে যাবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোব বাস্তবতা বিষয়টি আরো শক্তভাবে প্রমাণ করছে। বিভিন্ন দেশের নানা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল ইসলামি ভাবধারা ও গঠনতন্ত্র বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরও সেক্যুলার হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যাকাররা এর ইসলামি কাঠামোও দেখাতে পারছে না। সেক্যুলারিজমের যে কাঠামো তারা দেখানোর চেষ্টা করে, তা আসলে ইসলামসমর্থিত কাঠামো নয়। তারা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটাই ইসলামি হিসেবে দেখাতে চায় (আর এজন্যই তারা এরদোগানের তুরস্ককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ এরদোগানের দেশেও যেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়, তা কখনোই ইসলামসমর্থিত নয়)। যেমন, যদি কেউ বলে সেক্যুলারিজমের মানে হলো সকল ধর্ম ও মতের প্রতি উদার এবং নিরপেক্ষ হওয়া, তা হলে তার এই দাবি ভুল। কারণ সেক্যুলারিজমের এই কাঠামোকেও ইসলাম সমর্থন করে
না। ইসলাম ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম ও মতকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন, সেক্যুলারিজম তার বাইরের কোনো মতকে সহ্যই করে না। (ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

তৃতীয়ত, তারা যাকে সেক্যুলারিজম বলছে, তা আসলে সেক্যুলারিজম নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন কিংবা বর্তমান সময়ের নতুন কোনো বিষয়ের আইনকে ইসলামি শরিয়ত সেক্যুলারিজম বলে না। ইসলামে এটাকে কিয়াস কিংবা ইজতিহাদ বলে। সেক্যুলারিজমকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তা হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরিয়াহ হওয়া।

الحكم بما أنزل الله

(আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রায়) প্রদানের চর্চা থাকা। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই হাকিমিয়্যাত। এটাকে আরো মজবুত করার জন্য 'দার'-এর প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। দারুল ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সালাফরা যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামি শরিয়াহ বিজয়ী হওয়া। ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকা। এখানে 'দার' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এ কারণেই ইসলামি ইমামাতের বাইয়াতই সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উপর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আল্লামা মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহর 'আহকামে সুলতানিয়া' দেখা যেতে পারে।

সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদের প্রচলনের সুযোগ না দেওয়া, জিম্মিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, হুদুদ বাস্তবায়ন করা- এসব হাকিমিয়্যাতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ আছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রে যে নির্দেশনা রয়েছে, তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অমুসলিমরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। আবার নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করাটাও হাকিমিয়্যাহর আওতাভুক্ত। মোটকথা, ইসলামি শরিয়াহ ও আহকামকে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হলো হাকিমিয়্যাহ, যা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলকেই বিচারক মানা। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাতকে না বুঝার কারণে তারা দুইভাবে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এক. মুজতাহিদদের কর্ম ও সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নকে গুলিয়ে ফেলা। মুজতাহিদদের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ি হুকুম বের করা। তাদের কাজের ভিত্তি থাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা। সালাফদের বুঝকে পুঁজি করেই তারা ইজতিহাদ করেন। তারা নতুন নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন না এই ক্ষেত্রে। যারাই সালাফদের বুঝের বাইরে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইবে, তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য দিকে সেক্যুলারদের আইনের ভিত্তি থাকে মানবীয় প্রবৃত্তি ও বিবেক। তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে, যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাতের হুকুম হিসেবে

আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং মুজতাহিদদের কর্ম এবং সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের মাঝে বরং তাওহিদ ও শিরকের সম্পর্ক। একটি ঈমান, অপরটি কুফর।

দুই. ইসলামি শরিয়তকে অপূর্ণাঙ্গ এবং অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো। এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা জানি আমাদের দীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পালনীয় একমাত্র দীন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি শরিয়তে মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সমাধান ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে থাকবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণী হিসেবে।(সুরা নাহল- আয়াত ৮৯)

ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ এই শরিয়তকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে মানুষের ইবাদত ও দায়িত্ব পালন এবং জীবনপরিচালনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীনের পরিপূর্ণতা লাভের স্বীকৃতি নিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।(সুরা মায়িদা- আয়াত ৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে এই দীন পূর্ণাঙ্গ নয়; পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সে আল্লাহর এই আয়াত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। দীন পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানব- জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে শরিয়ত মৌলিকভাবে কোনো না কোনো নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এখন এসব মূলনীতি থেকে শাখাগত বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত থাকবে। মনে রাখতে হবে শরিয়তের মূলনীতি মেনে মুজতাহিদগণ নব উদ্ভাবিত যেসব বিষয়ের মাসআলা বের করেন, যদিও তা বাহ্যত মানবীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই 'বিমা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন) এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা প্রকাশ পায় একজন মুত্তাকি মুজতাহিদের গবেষণার মাধ্যমে। কারণ, এখানে মূলনীতি মানা হচ্ছে শরিয়তকে।

আমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ। মানব-জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যার ব্যাপারে শরিয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। এখন হতে পারে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে অথবা কোনো মূলনীতির আওতায় এর আলোচনা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোনো নতুন বিষয় সামনে আসেনি, যা ইসলামের কোনো মূলনীতির আওতায় পড়েনি কিংবা তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম প্রয়োগ করা যায়নি। শরিয়তের নস নির্দিষ্ট; কিন্তু সেগুলো ব্যাপক। কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় আসবে ও ঘটবে, শরিয়ত সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যেকোনো সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

রেফারেন্স :

এখানের বেশিরভাগ তথ্যই নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বই থেকে, গুগল থেকে। নিম্নে বইগুলোর নাম দেওয়া হল:

১/ সংশয়বাদী

২/ হিউম্যান বিয়িং

৩/সেকুলারিজম